22 FEB 2017

দৈনিক
ইত্তেফাক

জিপিএ-৫ বনাম সত্যিকার মেধার উন্নয়ন

ড. সিরাজুল ইসলাম উকিল

ছোটবেলা থেকেই আমরা শুনে আসছি, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আসলেই তাই। মেরুদণ্ড ছাড়া যেমন কোনো প্রাণী সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ছাড়াও একটি জাতি সোজা হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারলে সমাজে তার কোনো মূল্যও নেই। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে লাখো শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে যে জাতির জন্ম, তারতো পেছন ফিরে তাকানোর সময় নেই, শুধু সামনে এগিয়ে চলার পালা। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব অবহেলার কারণে আজ আমরা সত্যিকারভাবে মেধার স্ফুরণ থেকে পিছিয়ে পড়ছি। আজ আমাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করার সময় এসেছে, শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে আমাদের সর্বস্তরের মানুষের যে দায়িত্বটুকু ছিল, তা কি আমরা সকলে পালন করতে পেরেছি? আমরা শুধুই একতরফা সরকারের ওপর দায় চাপিয়ে দায় মুক্তির স্বাদ নিতে অভ্যস্ত। তাতে কি আমাদের সম্মুখপানে পথচলা মসৃণ হয়? না, হয় না! বরং আরেক ইঞ্চি পেছনে চলে যেতে হয়।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সম্মান শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল দেখলাম, পাসের হার শতকরা ১৫, যা আমাদের হতাশ করেছে। বিশেষত বাংলা, ইংরেজি ও গণিতে যদি একজন ছাত্রের দুর্বলতা থাকে, তবে তার ভিত কিছুতেই মজবুত হতে পারে না। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাপ্ত জিপিএ'র মান দিয়ে শিক্ষার মান ও মেধা কি যাচাই করা যাচ্ছে? এ দায় আমাদের সবার। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। এখানেই সন্তানের বিষয়গত ভিত গড়ে দিতে হবে, নইলে তার জিপিএ'র মান ভালো থাকা সত্ত্বেও সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাবে না। যাদের পরীক্ষায় জিপিএ'র মান এবং বিষয়গত ভিত দুটোই মজবুত তাদের কথা আলাদা। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ের, পরীক্ষায় জিপিএ'র মান ভালো থাকা সত্ত্বেও যাদের বিষয়গত ভিত মজবুত নয়, তাদের ব্যাপারে প্রশ্ন উঠাটাই স্বাভাবিক। কেন তারা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় পাস মার্ক পাচ্ছে না?

মূলত আজকাল অনেক অভিভাবক সারাক্ষণ সন্তানের জিপিএ-৫ প্রাপ্তির ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। সেক্ষেত্রে তারা কী শিখল সেটা তাদের কাছে মুখ্য বিষয় নয়। বিশেষ করে মা অভিভাবকগণ এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। অনেক অভিভাবক স্কুলিংয়ের চেয়ে বাইরের ব্যক্তিগত কোচিংকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অনেকেই সন্তানকে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য অসুস্থ ও অস্থির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। কেউ কেউ আবার সন্তান শিখছে কিনা বা বাংলা, ইংরেজি ও গণিতে তার ভিত মজবুত হলো কিনা, সেদিকে নজর না দিয়ে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের দিকে তাকিয়েই বুঁদ হয়ে থাকেন। এমন কিছু অভিভাবকও আছেন যারা সন্তানের লেখাপড়ার পাশাপাশি অন্যান্য সহপাঠ্য কার্যক্রমের দিকে ফিরেও তাকাতে চান না। অথচ সন্তান ভালো ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও বাগ্মিতা, বিতর্ক, স্কাউটিং, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মতো বিষয়াবলীতে অংশগ্রহণ করে না। ফলে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, সততা, পোশাক-আশাকে পরিপাটি, সাধারণ জ্ঞান, সমাজসেবামূলক কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান অর্জন করতে পারে না সে। এসব শিখন ও নিজ জীবনে এর প্রতিফলন ছাড়া মানুষের মতো মানুষ হওয়া কঠিন। এভাবে নিজের উন্নয়ন সম্ভব হলেও সমাজের জন্য সে থেকে যায় বোঝা হয়ে।

দেখা যায়, কিছু অভিভাবক সন্তানের খাতায় এক বা দুই নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য শিক্ষকের সঙ্গে প্রচণ্ড পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, যা একজন শিক্ষকের জন্য খুবই বিব্রতকর। আবার অনেক শিক্ষক আছেন যারা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নিঃস্বার্থভাবে পরামর্শ প্রদান ও তার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরিপূর্ণভাবে সহযোগিতা করলেও অনেকে করেন না। কিছু শিক্ষক এমনও আছেন যারা ভাবেন, স্কুল বা কলেজে যাব, ক্লাস বা পরীক্ষা নেব, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন করব, ব্যস, এইতো সব। তারা ভাবতেই চান না যে, এই কর্মপন্থা শুধু ভালো বা মেধাবী ছাত্রের বেলায় প্রযোজ্য, পিছিয়ে পড়া ছাত্রের বেলায় এ তত্ত্ব চলে না।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে আমাদের অভিভাবকদের এই মর্মে সচেতন হতে হবে যে, জিপিএ-৫ প্রাপ্তি নয়, বরং তার সন্তানকে অনেক কিছু জানতে হবে, বুঝতে হবে, অর্জন করতে হবে সকল বিষয়ের মৌলিক জ্ঞান, হতে হবে মেধাবী ও পরিশ্রমী। অভিভাবকদের নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার বিষয়ে অধিকতর যত্নশীল হতে হবে। অতঃপর শালীনতা বজায় রেখে অভিভাবক সমাবেশে এই মর্মে চাপ প্রয়োগ করতে হবে, বা অনুরোধ করতে হবে যে, বাইরের কোচিং

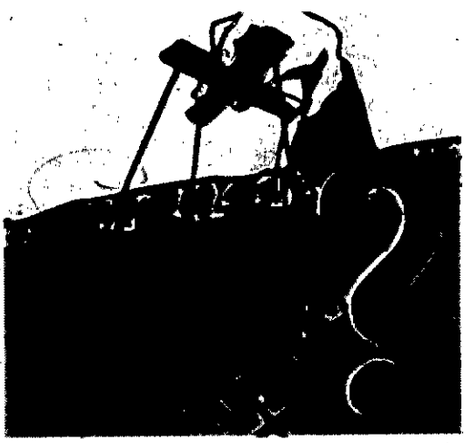

বন্ধ করে ক্লাসের মান বৃদ্ধি করা উচিত। এতে যদি এমন হয় যে, শিক্ষকদের মধ্যে বড় একটি সংখ্যা মানতে চাইছে না, বা জোর আপত্তি করতে চাইছে, সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত ফি'র বিনিময়ে নিয়মিত ক্লাসের আগে বা পরে নিয়ন্ত্রিত কোচিং বা অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে করে বড় যে সুবিধাগুলো আসবে তা হলো-বাইরের কোচিং এর পড়া ও স্কুলের ক্লাসের পড়া দুটো সারতে গিয়ে ছাত্র তালগোল পাকিয়ে ফেলা থেকে রক্ষা পাবে।

মোদ্দাকথা হলো, সন্তানদের পড়ালেখার উন্নতিতে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষক ও অভিভাবকদের আরো সজাগ হতে হবে। প্রতিষ্ঠান প্রধান ও শিক্ষকদের সমন্বিত উদ্যোগে ভালো ছাত্র, দুর্বল ছাত্র, বিষয়ভিত্তিক দুর্বল ছাত্র, চরিত্রবান ছাত্র, অসৎ ছাত্র, ভদ্র ছাত্র, দুষ্টু ছাত্র ইত্যাদি নামে আলাদা আলাদা তালিকা তৈরি করে নিয়মিত মনিটরিং, ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ বা সাক্ষাৎ এমনকি বাসস্থান পরিদর্শনের মাধ্যমে ছাত্রদের মানোন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ছোট ছোট দলে পরামর্শ সভা করতে হবে। আর সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের দিকে জোর দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের একঘেয়েমি দূর হয় এবং বিকশিত হয় মানবিক গুণাবলী। তবেই শিক্ষার্থীরা শারীরিক ও মানসিক উভয়ভাবে বেড়ে উঠবে। হবে ভালো মানুষ। বলাবাহুল্য, আজ ভালো ছাত্র হওয়ার চেয়েও ভালো মানুষ হওয়াটাই জরুরি হয়ে পড়েছে।

● লেখক : বরিশাল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ